সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ :

সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্পের মূল বক্তব্য হলো পুঁজিবাদী আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শক্তির ধূর্ততা এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মেলবন্ধনে কীভাবে সাধারণ মেহনতি ও আদিবাসী মানুষ শোষিত হয় এবং তাদের কন্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় তার এক নির্মম রাজনৈতিক দলিল। বাংলা কথাসাহিত্যে ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত ‘ফসিল’ গল্পটি এক যুগান্তকারী সৃষ্টি।

সুবোধ ঘোষের **‘ফসিল’** বাংলা রাজনৈতিক ও সামাজিক কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক কালজয়ী ও যুগান্তকারী ছোটগল্প। এই গল্পে লেখক অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ—এই তিন অশুভ শক্তি হাত মিলিয়ে সাধারণ মেহনতি ও আদিবাসী মানুষকে শোষণ করে এবং তাদের কন্ঠস্বরকে মাটির নিচে স্তব্ধ করে দেয়।

গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে মূলত তিনটি প্রধান চরিত্র এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করা তিনটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে কেন্দ্র করে:

১) **অঞ্জনগড়ের মহারাজা (সামন্ততন্ত্রের প্রতীক):** তিনি প্রাচীন, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলাসী রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি। নিজের সিংহাসন, বিলাসিতা এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তিনি ব্রিটিশ শক্তির পদলেহন করতে এবং নিজের প্রজাদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

২) **মিস্টার ডুলিন (পুঁজিবাদের প্রতীক):** ডুলিন হলেন একজন ধূর্ত ও অর্থলোভী ব্যবসায়ী, যিনি অঞ্জনগড়ের খনি লিজ নিয়ে তেল উত্তোলনের ব্যবসা ফেঁদেছেন। তার কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এবং খনির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

৩) **মিস্টার গ্রীন (ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক):** ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিস্টার গ্রীন হলেন পর্দার আড়ালের আসল চালিকাশক্তি। তিনি একদিকে মহারাজার ওপর ঔপনিবেশিক চাপ সৃষ্টি করে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, অন্যদিকে মিস্টার ডুলিনের মতো পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে রাষ্ট্রের পুলিশ ও সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করেন।

গল্পের কাহিনী শুরু হয় অঞ্জনগড়ের খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। মিস্টার ডুলিন সাহেব যখন অঞ্জনগড়ে খনির কাজ শুরু করেন, তখন আদিবাসীদের জঙ্গল ও জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। জীবিকার তাগিদে এই সরল মানুষগুলোই নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে ডুলিনের খনির সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়। কয়লা ও তেল উত্তোলনের জন্য শ্রমিকদের দিনরাত অমানবিক খাটুনি খাটানো হয়, কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের জোটে নামমাত্র মজুরি আর চরম অবহেলা। শ্রমিকদের নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যের কোনো তোয়াক্কা ডুলিন সাহেব করেন না। পুঁজিপতি ও রাজতন্ত্রের এই যৌথ শোষণে শ্রমিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শোষণের মাত্রা যখন চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন অঞ্জনগড়ের শান্ত, সরল সাঁওতাল ও খনি শ্রমিকদের মধ্যে চেতনার উদয় হয়। তারা বুঝতে পারে যে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে ডুলিন সাহেব ও মহারাজা ধনী হচ্ছেন, আর তারা দিন দিন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছেন। শ্রমিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ইউনিয়ন বা জোট গঠন করে। তারা ন্যায্য মজুরি, কাজের নিরাপদ পরিবেশ এবং মানবিক আচরণের দাবিতে ধর্মঘট ও প্রতিবাদের ডাক দেয়। এই প্রথম অঞ্জনগড়ের বুকে রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ভিত কেঁপে ওঠে। শ্রমিকদের এই ঐক্য ও লড়াইয়ের মানসিকতা গল্পটিকে এক প্রগতিশীল মাত্রা দান করে।

শ্রমিকদের এই উত্থান ও প্রতিবাদ মিস্টার ডুলিন এবং মহারাজা সহজে মেনে নিতে পারেন না। আন্দোলন দমন করতে মিস্টার গ্রীনের নির্দেশে ব্রিটিশ পুলিশ ও মহারাজার বাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা অসম্ভব দেখে শোষক শ্রেণী এক ভয়ঙ্কর ও নৃশংস ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। খনি গর্তের ভেতরে যখন শত শত শ্রমিক কাজ করছিলেন এবং নিজেদের অধিকারের দাবিতে অনড় ছিলেন, তখন মিস্টার ডুলিন ও মহারাজার যৌথ নির্দেশে খনির সমস্ত প্রবেশপথ ও বাতাস চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খনির ভেতরের অংশ ধসিয়ে দেওয়া হয়। জীবন্ত, চলন্ত ও প্রতিবাদী মানুষগুলোকে মাটির নিচে আটকে রেখে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

গল্পের শেষ দৃশ্যে লেখক ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সত্যের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ভূগর্ভের প্রচণ্ড চাপে যেভাবে হাজার বছর ধরে উদ্ভিদ

বা প্রাণী পাথরে পরিণত হয়ে 'ফসিল' বা জীবাশ্মে রূপ নেয়, অঞ্জনগড়ের এই খনি শ্রমিকদেরও ঠিক একইভাবে মাটির নিচে চাপা দিয়ে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো। গল্পের শেষে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষ যখন কোনোদিন এই খনি খনন করবে, তখন তারা কেবল কয়লা বা তেল পাবে না, বরং মাটির নিচে খুঁজে পাবে মানুষের হাড়গোড়ের অবশেষ। এই অবশেষগুলোই হলো শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর ফসিল।

সুবোধ ঘোষের **'ফসিল'** গল্পটির প্রধান দিকগুলো হলো –

- **ফসিলের রূপক অর্থ:** সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জীবজন্তু বা গাছপালা মাটির নিচে চাপা পড়ে লক্ষ বছর পর 'ফসিল' বা জীবাশ্মে পরিণত হয়। কিন্তু সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন যে মানুষের তৈরি হানাহানি, যুদ্ধ বা নির্মম ব্যবস্থায় মানুষের তৈরি করা মৃত্যুও একদিন ভবিষ্যতে ফসিল হয়ে উঠতে পারে—যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও কল্পনাতীত।
- **সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি:** ১৯৪০-এর দশকের পটভূমি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সামাজিক পালাবদলের প্রতিফলন এই গল্পে রয়েছে।
- **মানুষ ও যন্ত্রের সম্পর্ক:** লেখকের অন্য বিখ্যাত গল্প 'অযান্ত্রিক'-এর মতোই এখানেও যন্ত্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক ভিন্ন ও দার্শনিক মাত্রা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- **অভিনব আঙ্গিক:** প্রচলিত চিরাচরিত গল্পের ধারা থেকে সরে এসে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে গল্পটিকে একটি অনন্য শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটি কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের খনি শ্রমিকদের কাহিনী নয়, এটি বিশ্বজুড়ে পুঁজিপতি ও শাসকের হাতে শোষিত সর্বহারা মানুষের চিরন্তন ট্র্যাজেডির এক কালজয়ী রূপক। যেকোনো আধুনিক ও জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতার অট্টালিকা আসলে লাখ লাখ মেহনতি মানুষের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। পুঁজিপতিদের মুনাফার চাকা সচল রাখতে কীভাবে মানুষের রক্তকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং রাষ্ট্র কীভাবে সেই অপরাধকে আড়াল করে, তার এক অসামান্য ও আপসহীন আলেখ্য এই গল্পটি।